অধ্যায় ৭ : চণ্ডীমঙ্গল

বিন্যাসক্রম

৭.১ জ্ঞাতব্য বিষয়
৭.২ কাব্য পরিচিতি
৭.৩ কবি পরিচিতি
৭.৪ কাহিনির সংক্ষিপ্তসার
৭.৫ কবি কৃতিত্ব
৭.৬ ঔপন্যাসিক লক্ষণ
৭.৭ চরিত্র-নির্মাণ
৭.৮ সমাজচিত্র
৭.৯ অধ্যায় সংক্ষেপ
৭.১০ অধ্যায়টি পাঠ করে আমরা কী শিখলাম
৭.১১ অতিরিক্ত পঠন
৭.১২ অগ্রগতি নির্ধারক উত্তর-সংকেত
৭.১৩ আদর্শ প্রশ্নাবলি

৭.১ জ্ঞাতব্য বিষয়

এই অধ্যায়টি পড়ে আপনি—

- কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তী রচিত ‘চণ্ডীমঙ্গল কাব্য’- এর আখেটিক খণ্ডের কাহিনি ভাগের সঙ্গে পরিচিত হবেন।
- ‘চণ্ডীমঙ্গল’ কাব্যে ষোড়শ শতকের সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ধর্মীয় বিভিন্ন দিকের চিত্র আছে।
- কাহিনির আলোচনাকে অবলম্বন করে অধ্যায়ের শেষে যে প্রশ্নগুলো দেওয়া হয়েছে তার উত্তর তৈরি করতে পারবেন এবং নির্বাচিত অংশ সমূহের ব্যাখ্যাও করতে পারবেন।

৭.২ কাব্য পরিচিতি

মধ্যযুগের মঙ্গলকাব্য ধারায় অন্যতম কাব্য হচ্ছে চণ্ডীমঙ্গল কাব্য, যা দেবী চণ্ডীর মাহাত্ম্য ও পূজা প্রচারের উদ্দেশ্যে রচিত। ‘চণ্ডীমঙ্গল’ কাব্যের রচনা কাল নিয়ে নানা মতভেদ আছে। তা সত্ত্বেও মোটামুটিভাবে বলা যায় চৈতন্য-সমসাময়িক যুগেই এই কাব্যের রচনা হয়েছিল। ‘চণ্ডীমঙ্গল’ কাব্যটি দু’টি

খণ্ডে বিভক্ত- (১) আখেটিক খণ্ড বা ব্যাধ খণ্ড ও (২) বণিক খণ্ড ,এইকাব্যের দেবী চণ্ডীকে নিয়ে নানা মতামত রয়েছে। সম্ভবত তিনি প্রথমে অনার্য দেবী, পশুদের দেবী রূপে পূজিত হতেন। পরবর্তীকালে লৌকিক দেবী চণ্ডীকে মঙ্গলকাব্যের অনেক কবিরা দুর্গা আর অন্নদার সঙ্গে এক করে দেখেছেন। চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের শুরুতে কবি মুকুন্দরাম চক্রবর্তী বিভিন্ন দেবদেবী বন্দনা গান করেছেন , যেমন-সূর্য বন্দনা, গণেশ বন্দনা, দেবী চণ্ডীর বন্দনা ইত্যাদি। এই অংশে কবি তাঁদের থেকে আশীর্বাদ প্রার্থনা করেছেন যাতে তাঁর এই গ্রন্থটি প্রচার ও প্রসার লাভ করতে পারে। এর পরই-কবি যে গুরুত্বপূর্ণ অংশের সংযোজন করেছেন তা হল গ্রন্থ উৎপাত্তির কারণ এবং সেইসঙ্গে অবশ্য রয়েছে দেবীর স্বপ্নাদেশ প্রসঙ্গ শুধু তাই নয় তার সাথে যুক্ত করেছেন মধ্যযুগী সমাজ। এই ভাগটিতে কবি মুকুন্দ প্রকাশ করেছেন গ্রন্থটি রচনার কারণ অবশ্য দেবীর স্বপ্নাদেশ প্রসঙ্গ, শুধু তা-ই নয় তার সাথে যুক্ত করেছেন তৎকালীন বাস্তবতা। কবি মুকুন্দের কাব্য 'চণ্ডীমঙ্গল' নামে প্রচলিত হয়ে আসলেও এই কাব্যের প্রকৃত নাম 'অভয়ামঙ্গল'।

৭.৩ কবি পরিচিতি

'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যের কবি মুকুন্দরাম চক্রবর্তী। মধ্যযুগে বাঙালি যে কয়জন প্রতিভাশালী কবির আবির্ভাব হয়েছিল, মুকুন্দ চক্রবর্তী এঁদের মধ্যে অন্যতম। কারণ 'চণ্ডীমঙ্গল' অনেক কবিরা নিজের মতো করে লিখলেও কবি মুকুন্দের কাব্যটিই বিখ্যাত হয়েছিল। তিনি জীবন রসিক কবি বলেই তাঁর কাব্যের মৌলিকতা ও সৃজনশীলতার জন্য বাংলা সাহিত্য জগতে তিনি এক বিশেষ আসন অধিকার করে নিতে পেরেছেন। মুকুন্দরাম নামটি প্রচলিত থাকলেও কবির আসল নাম মুকুন্দ এবং তাঁর উপাধি হচ্ছে 'কবিকঙ্কণ'। কবিকে এই-উপাধি দিয়েছিলেন তাঁর আশ্রয়দাতা রঘুনাথ রায় মহাশয়।

কবি আত্মপরিচয়-অংশ থেকে জানা যায় কবি মুকুন্দের পূর্বপুরুষ মাধব ওঝার-নিবাস ছিল কর্ণপুরে। দামিন্যাতে ছিল কবির নিবাস (বর্তমানে বর্ধমান জেলার রায়না থানায়)। পুরুষানুক্রমে দামিন্যার তালুকদার গোপীনাথ নন্দীর জমি ভোগ করলেও পরবর্তী কালে রাজনৈতিক ও সামাজিক কারণে সেই ভিটে মাটি ত্যাগ করে শেষে মেদিনীপুরের আরড়া গ্রামে বাঁকুড়া রায়ের গৃহে আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং তার পুত্র রঘুনাথ রায়ের গৃহ শিক্ষক পদে নিযুক্ত হন। আর এইখানে থেকেই কবি মুকুন্দ তাঁর এই বিখ্যাত গ্রন্থটি রচনা করেন। বিভিন্ন গবেষকদের মতানুসারে ১৫৮৫ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৬০৪ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে কবি এই কাব্যটি রচনা করেছেন বলে অনুমান করা হয়।

৭.৪ কাহিনির সংক্ষিপ্তসার

আখেটিক খণ্ড কালকেতু ও ফুল্লারার কাহিনি :

দেবী পদ্মার উপদেশে ও পরামর্শে চিরদরিদ্র শিবের গৃহিণী চণ্ডী কৌশলে নিজের পূজা প্রচারের উদ্দেশ্যে নিরপরাধ শিবপূজার জন্য পুষ্প সংগ্রহকারী নারী-নীলাম্বরকে শাপভ্রষ্ট করালেন স্বয়ং

মহাদেবকে দিয়ে। সেই পাপভ্রষ্ট নীলাম্বর মর্ত্যে ব্যাধের ঘরে ধর্মকেতুর পুত্র কালকেতু নামে জন্ম নিলেন এবং তার স্ত্রী ছায়া ব্যাধকন্যা ফুল্লরা নামে সঞ্জয় ব্যাধের ঘরে জন্ম নেন। এই-নীলাম্বর ও ছায়া প্রকৃত পক্ষে দেবরাজ ইন্দ্রের পুত্র ও পুত্রবধূ। 'দিনে দিনে বাড়ে কালকেতু'- শৌর্যে-বীর্যে, পরাক্রমে কালকেতু ব্যাধ জাতির নেতা হয়ে উঠে। রূপবান কালকেতুর সঙ্গে রূপসী ফুল্লরার যথাসময়ে বিবাহ সম্পন্ন হয় পিতা ধর্মকেতুর আগ্রহে। কালকেতুর এত অসীম পরাক্রম শক্তি যে বনের পশুরা তার ভয়ে এস্ত হয়ে থাকে। সে হরিণের পিছনে ছুটে তাকে ধরে শিকার করে। ভয়ে কাতর পশুরা তাই-দেবী চণ্ডীর শরণাপন্ন হলে দেবী তাদের অভয় দান করেন এবং একদিন তিনি সব পশুকে লুকিয়ে রেখে দেন। তারপর নিজে সুবর্ণ-গোধিকার ছদ্ম বেশে কালকেতুর জন্য প্রতীক্ষা করতে থাকেন। অন্যদিকে শিকারের উদ্দেশ্যে বনে এসে কোন পশু দেখতে না পেয়ে সুবর্ণ-গোধিকাকেই ধনুকের ছিলায় বেঁধে বাড়ি নিয়ে আসেন। শিকারের এই হেন অবস্থা দেখে অপ্রসন্ন মনে কালকেতু বাসি মাংস হাটে বিক্রির উদ্দেশ্যে এবং প্রতিবেশির বাড়ি থেকে খুদ ধার করতে ফুল্লরা বের হয়ে গেলেন।

এই সুযোগে দেবী চণ্ডী- স্বর্ণ- গোধিকা বেশ ত্যাগ করে অপরূপ রমণী বেশে কালকেতুর ঘরের দাওয়ায় বসে থাকলেন। ফুল্লরা ফিরে এসে দেবীকে তার পরিচয় জিজ্ঞাসা করলে ফুল্লরাকে ছদ্মবেশিনী চণ্ডী বললেন-'এনেছে তোমার স্বামী বাধি নিজ গুণে'। ফুল্লরা একথা শুনে মনে মনে ভাবে তিনি নিশ্চয়ই তাঁর সতীন, যাকে কালকেতু নিজে নিয়ে এসেছেন। তবে ফুল্লরা ও ছেড়ে দেওয়ার পাত্র নন। তিনি নিজের বার মাসের দুঃখের বর্ণনা শুনিয়ে অনেক কাকুতি মিনতি করে দেবীকে বিদায় জানাতে ব্যর্থ হলে স্বামী কালকেতুকে খবর দিতে বাজারের উদ্দেশ্যে রহওয়ানা হন। পথে কালকেতুর সাথে দেখা হলে অশ্রু পূর্ণ চোখে প্রশ্ন করে 'কাহার ষোড়শী কন্যা আনিয়াছ ঘরে।' বিস্ময়ে হতবাক ফুল্লার কালকেতু বাড়ি ফিরে দেখে ফুল্লরা অভিযোগ সত্যি। তখন কালকেতু দেবী চণ্ডীকে অন্যত্র চলে যেতে বলেন- " ছাড় এই স্থান মাগো ছাড় এই স্থান / আপনি রাখিলে রহে আপনার মান"। এতকিছু করার ত্যাগ পরও দেবী সেই স্থান থেকে যেতে না চাইলে কালকেতু ধনুতে শর যোজনা করেন। কিন্তু সেই শরও যখন ব্যর্থ হল তখন দেবী নিজ মূর্তি ধারণ করেন এবং কালকেতুকে সাতঘড়া ধন ও বহুমূল্যের একটি আংটি দিয়ে নির্দেশ দিলেন- পুজিবে মঙ্গলবারে পাতাইবে জাত, গুজরাট নগরের তুমি হবে নাথ।"

দেবী প্রদত্ত ধন ও আংটি গ্রহণ করে কালকেতু সেই আংটি ভাঙাতে গেলে ধূর্ত বণিক মুরারি শীল নামমাত্র মূল্যে সেই আংটি কিনে 'কালকেতুকে ঠকানোর পরিকল্পনা করে বলেছে-

"সোনা-রূপা নহে বাপ্পা এ বেঙ্গা পিতল।
ঘসিয়া মাজিয়া বাপু করেছ উজ্জ্বল ।।"

কালকেতু তার কথা নামেনে অন্য জায়গায়-যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলে দেবীর কৃপায় দৈববাণী ঘটে। ভয়ে মুরারি শীল আংটির সঠিক মূল্য মিটিয়ে দেয়। তারপর বিপুল অর্থের সহায়তায় বন কেটে কালকেতু গুজরাট নগর পত্তন করলেন। এই নগরে হিন্দু--মুসলমান নির্বিশেষে নানা জাতির বসতি গড়ে উঠল।

এই নাগরিকদের মধ্যে ভাঁড়ু দত্ত নামে এক ধূর্ত কায়স্থ কালকেতুকে বলল "যমন পাকিবে খন্দ পাতিবে বিষম দ্বন্দ্ব।/ দরিদ্রের ধান্যে দিবে নাগা।" কালকেতু ভাঁড়ু দত্তের কথায় পাত্তা না দেওয়ায় সাধারণ প্রজাদের উপরে-অত্যাচার শুরু করে। ফলে প্রজারা তার বিরুদ্ধে কালকেতুর কাছে নালিশ জানালে ভাঁড়ুকে তাঁর রাজ্য থেকে বহিষ্কৃত করে দেন। অপমানিত ভাঁড়ু গুজরাটের পার্শ্ববর্তী কলিঙ্গরাজ্যকে কালকেতুর বিরুদ্ধে উত্তেজিত করে যুদ্ধের ঘোষণা করে। সেই যুদ্ধে কালকেতু পরাজয় হয় এবং কালকেতু বন্দী হন। কলিঙ্গ রাজের কারাগারে অতিকষ্টে দিন যাপন করলে কালকেতু দেবী চণ্ডীর শরণাপন্ন হলে দেবী কলিঙ্গরাজের স্বপ্ন এসে তাকে ভীতি প্রদর্শন করেন। তিনি স্বপ্নে জানান যে তাড়াতাড়ি কালকেতুকে মুক্ত না করলে তার কলিঙ্গরাজ্য ধ্বংস হয়ে যাবে। দেবীর বরপুত্র যে কালকেতু একথা জেনে কলিঙ্গরাজ কালকেতুকে তাঁর রাজ্যসহ মুক্তি দিলেন এবং ভাঁড়ু দত্তকে উচিত শাস্তি প্রদান করলেন।

হারানো রাজ্য ফিরে পেয়ে কালকেতু মহাসমারোহে দেবীর পূজা করলেন। তারপর বহুদিন পরম শান্তিতে কালকেতু ও ফুল্লরা রাজত্ব করার পর পুত্রকে সমস্ত কিছুর উত্তরাধিকারী করে শাপান্তে নীলাম্বর ও ছায়ারূপে ইন্দ্রের রথে চড়ে স্বর্গলোকে ফিরে গেলেন। এরপরে থেকেই মর্তভূমে পৃথিবীতে দেবী চণ্ডীর পূজা প্রচারিত ও প্রতিষ্ঠিত হল।

৭.৫ কবি কৃতিত্ব

মধ্যযুগের কবি মুকুন্দ চক্রবর্তী একজন জীবনরসিক কবি। কিন্তু তাঁর 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যে এমন কিছু দুঃখপূর্ণ ঘটনার উল্লেখ আছে যে, এই দুঃখের চিত্র বিশ্লেষণ করলে মনে হতেই পারে, তবে কী কবি দুঃখবাদী? গ্রন্থোৎপত্তির কারণ, হরগৌরীর দাম্পত্য জীবন, ফুল্লরার বারমাস্যা, বনের পশুদের দুঃখ নিবেদন প্রভৃতি অংশের আখ্যান বর্ণনায় কবির কলম পাঠকের হৃদয়কে সিক্ত করে তুলেছে। তবু বলা যায় কবি মুকুন্দ একেবারে বাস্তববাদী-কবি। কারণ তিনি দুঃখ বর্ণনাতে থেমে থাকেননি । দুঃখ থেকে উত্তরণের পথ খুঁজে পেতে সচেষ্ট হয়েছেন। তাই তিনি দুঃখবাদী বা জীবনবিমুখ বা নৈরাশ্যবাদী কবি ছিলেন না মোটেও। বরং বলা যেতে পারে তৎকালীন সমাজের প্রতি বাস্তব দৃষ্টি রেখে সাধারণ দারিদ্রলাঞ্ছিত মানুষের জীবন যাত্রার নিখুঁত ছবি এঁকেছেন। আর এই বাস্তবকে তাঁর কাব্যে রূপ দিতে গিয়ে নিজের মনের মাধুরীর সংযোজন করেছেন। তাতে বাস্তবজীবন যেন শিল্প চেতনার সঙ্গে মিশে গিয়ে অপূর্ব সৃষ্টি কৌশলে কাব্যটি সৌন্দর্য মণ্ডিত হয়ে উঠেছে। ফলে তুচ্ছাতিতুচ্ছ বিষয়গুলি পাঠকের পরম উপভোগ্য হয়ে উঠেছে। তিনি একজন মানবতাবাদী কবি ছিলেন। মর্ত্য মানুষের সুখ-দুঃখের চিত্র খুব সহজভাবে তাঁর কাব্যে ফুটে উঠেছে। গুজরাট নগর পতনের সময় কবি মুকুন্দ নতুন সমাজ গঠনের স্বপ্নকে কাব্যে বাস্তব করেছেন। সর্বজাতির, সর্বধর্মের মিলন ক্ষেত্র হয়ে ওঠেছে গুজরাট নগর। সেখানে মানবতার হানি কারক মানুষের কোন স্থান নেই। যার স্পস্টা উদাহরণ ভাঁড়ু দত্তের মতো চরিত্র। এই কাব্যে ধনী-দরিদ্র, স্বামী-স্ত্রী, পাইক-পেয়াদা, পরিবার, সতীন সম্পর্ক, দাসী, ব্যাধ, বেনে প্রকৃতি চরিত্রের

ভীড় এটাই স্পষ্ট করে যে কবির সুখ দৃষ্টি থেকে সমাজের কোনো দিকই বাদ পড়েনি। দক্ষ ভাস্কর্যশিল্পীর মতো নিখুঁত ভাবে নির্মাণ করেছেন, যা একজন কালজয়ী কবির পক্ষেই সম্ভব।

৭.৬ ঔপন্যাসিক লক্ষণ

আধুনিক সাহিত্যের অন্যতম শাখা হচ্ছে উপন্যাস। এরমধ্যে বাস্তব জীবনের দ্বন্দ্বময় রূপের সার্থক প্রতিফলন ঘটে। এর উপাদান মূলত ছয়টি- কাহিনি, চরিত্র, ভাষা, পরিবেশ, বাস্তবতা ও ঔপন্যাসিকের জীবনদর্শন; এসবই আধুনিক জীবনের সাথে সংপৃক্ত। কিন্তু মধ্যযুগের সাহিত্যে এই লক্ষণগুলির উপস্থিতি সত্যিই আশ্চর্যকর। বিশিষ্ট সমালোচক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এই গ্রন্থটিতে উপন্যাসের লক্ষণের অপ্রত্যাশিত আভাস লক্ষ্য করে মন্তব্য করেছেন- 'এ যুগে জন্মগ্রহণ করিলে তিনি সে কবি না হইয়া একজন ঔপন্যাসিক হইতেন, তাহাতে সংশয়মাত্র নাই।' এর কারণ হিসেবে তিনি চারটি উপাদানের কথা বলেছেন (১) বাস্তব চিত্র (৩) দক্ষ চরিত্রাঙ্কণ (৩) ঘটনা সন্নিবেশ (৫) আখ্যান ও চরিত্রের মধ্যে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম সম্বন্ধ স্থাপন।

উপন্যাসের প্রথম উপাদান কাহিনি সৃষ্টি হতে হয় কার্যকারণ পরম্পরায়; বলা বাহুল্য সেখানে চরিত্র হতে হবে বাস্তব ও দ্বন্দ্বময় আর ভাষা হবে চরিত্র উপযোগী ও প্রাণময়। বাস্তব জীবনের রূপ-রস, স্বপ্ন-কল্পনা, আশা-নিরাশা, মিলন-সংঘাত সমস্ত মা কিছু নিয়েই জীবন হয় পরিপূর্ণ যা উপন্যাসের অন্তঃসলিলা উপাদান স্বরূপ। ঔপন্যাসিকের জীবনাভিজ্ঞতাই তাঁর জীবন দর্শনের মূল সূত্র; যা গড়ে ওঠে তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ও বাস্তব উপলব্ধির সংযোগে। কবিকঙ্কণ মুকুন্দ চক্রবর্তী মধ্যযুগের ষোড়শ শতকের কবি। তাই আধুনিক যুগের একুশ শতকে বসে আধুনিক দৃষ্টি দিয়ে তাঁর কাব্যের ও মননের বিচার করলে তা সত্যিই অপ্রীতিকর হবে। কারণ তাঁর কার্যের কাল দেবমাহাত্ম্যমূলক। কাব্যের সময় ও বিষয়কে মাথায় রেখে পর্যালোচনা করলে কোন কোন ক্ষেত্রে ঔপন্যাসিকের সত্ত্বা বিদ্যমান প্রমাণ মেলে।

চণ্ডীমঙ্গলের দু'টি খণ্ডের তিনটি কাহিনিতে দেবখণ্ড এবং নরখণ্ডে কালকেতুর কাহিনি ও ধনপতির কাহিনি। মূল কাহিনি পরিচালিত হয়েছে মানুষের দ্বন্দময় জীবনের উত্থান পতনের ঘটনা দিয়ে। কাহিনি পাঠ করার সময় পাঠকের মনে হওয়া স্বাভাবিক যে কবিকঙ্কণের নির্মিত চরিত্রগুলি যেন হয়ে উঠেছে সাধারণ মানুষ ।

আখেটিক খণ্ডের মূল কাহিনি দেবী চণ্ডীর, পূজার প্রচার হলেও সেখানে কালকেতু ও ফুল্লরাই যেন কাব্যের চালিকাশক্তির ভূমিকা নিয়েছে। সেখানে একের পর এক ঘটনার বিবরণ যেমন-নিদয়ার সাধভক্ষণ, কালকেতুর জন্ম, কালকেতুর-বিবাহ, কালকেতুকে দেবীর ছলনা প্রভৃতি অংশে কবি মুকুন্দে যেভাবে পরিবেশিত করেছেন সেখানে উপন্যাসের লক্ষণকে ইঙ্গিত করছে। শুধু তা-ই নয় কাহিনির কার্যকারণ পরম্পরাও লক্ষ্য করার মতো। কালকেতুর বালক অবস্থা থেকে বড় হয়ে উঠার বাস্তবতার

আভাস দেয়। সময় ও পরিবেশ নিয়ে সচেতন কবি মুকুন্দ তাঁর গ্রন্থের শুরুতেই 'গ্রন্থোৎপত্তির কারণ' অংশে সমকালীন প্রেক্ষাপটকে বাস্তবসম্মত করে নির্মাণ করেছেন যেভাবে, সেখানে উপন্যাসের আরেকটি উপাদানকে সার্থক ভাবে প্রকটিত হয়েছে বলে মনে হয়। শুধু তা-ই নয় চরিত্র সৃষ্টিতে কবিকঙ্কণ ছিলেন সিদ্ধহস্ত। তাঁর সমকালীন কাব্যগুলিতে মানবজীবনের এমন চিত্রণ অন্য কেউ করেছেন বলে মনে হয় না। তিনি ছিলেন মানবজীবনের রূপকার। তাঁর সৃষ্ট ধূর্ত-চরিত্র- ভাঁড়ু দত্ত ও মুরারি শীল যেন অনবদ্য সৃষ্টি। সেইসঙ্গে যথোপযুক্ত ভাষার ব্যবহার কবি মুকুন্দের সচেতনতার অপূর্ব-নিদর্শন। এইসব চরিত্রের নির্মাণ কৌশল কবির গভীর জীবনাভিজ্ঞতা, সূক্ষ পর্যবেক্ষণ শক্তি, রাগ, বৈদগ্ধ্য ও তির্যক বাচনভঙ্গিকে পাঠকের সামনে তুলে ধরেছে। একের পর এক ঘটনা সন্নিবেশে সমস্ত কাব্য জুড়েই কবিকঙ্কণ যে ঔপন্যাসিক দক্ষতা দেখিয়েছেন তা অতুলনীয়।

অগ্রগতি নির্ধারক প্রশ্ন 'ক'

১। আখেটিক খণ্ডের কাহিনি সংক্ষেপে নিজের ভাষায় লিখুন। (১৫০-২০০ শব্দের মধ্যে)
২। কবি মুকুন্দরাম জীবনরসের কবি - সংক্ষেপে আলোচনা করুন। (১০০-২০০ শব্দের মধ্যে)
৩। গুজরাট নগর ও প্রজা পালনের বিবরণ অবলম্বনে মধ্য যুগীয় বাংলার সমাজ বিন্যাসের যে তথ্য চিত্রপাওয়া যায় তার পরিচয় দিন। (১০০-২০০ শব্দের মধ্যে)

৭.৭ চরিত্র নির্মাণ

কালকেতু:

চণ্ডীমঙ্গলের আখেটিক খণ্ডের নায়ক কালকেতু। তাঁর পিতা ব্যাধ ধর্মকেতু। মর্ত্যে পূজা প্রচারের অভীপ্সায় দেবী চণ্ডীর ষড়যন্ত্রে ইন্দ্রপুত্র নীলাম্বর মর্ত্য-ঘরে কালকেতু রূপে জন্ম নিয়েছে। মানব সন্তান কালকেতু তাঁর পূর্বজন্ম সম্পর্কে অবগত নেই। কবিকঙ্কণের কলমের টানে মর্ত্যের রক্ত-মাংসের মানুষ হয়ে উঠেছে।

কাব্যের মধ্যে কালকেতুকে নায়ক করে গড়ে তোলার আয়োজন যেন তার বাল্যকাল থেকেই করে নিয়েছেন। এক-দুই-তিন বছর বয়সে বালক কালকেতু ছুটে ছুটে-হরিণ-ধরে খেলে। ব্যাধ সন্তান কালকেতু অন্ত্যজ শ্রেণির মানুষ হওয়ায় তাঁর আচরণের মধ্যে ছিল আদিতা বা বন্যভাব। অরণ্যই ছিল তার আশ্রয়। গায়ে অসীম শক্তি, তাই সে যখন ধনুক হাতে তুলে নেয় তখন বনের নিরীহ প্রাণীকুল যেন প্রাণ দিতে বাধ্য হয়। 'পশুদের ক্রন্দন' অংশে দেবী চণ্ডীর কাছে কালকেতুর বিরুদ্ধের পশুদের অভিযোগ থেকে এই বিষয়টি স্পস্ট হয়1

পিতা ধর্মকেতুর আগ্রহে কিরাত নগরের ব্যাধ সঞ্চয় কেতুর কন্যা ফুল্লরার সাথে কালকেতুর বিবাহ হয়েছিল। সেই সময় সমাজে বহুবিবাহের প্রচলন থাকলেও কালকেতু সারা জীবন ফুল্লরার সাথেই

অতিবাহিত করেছিল। তা-ই তো ছদ্মবেশিনী ষোড়শী বামার রূপ-যৌবন দেখেও সে ভোলেনি। তবে কালকেতু ছিল প্রবল শক্তির অধিকারী। সারাদিন অক্লান্ত পরিশ্রম করার পর তার যে পরিমাণ ক্ষুধা-তৃষ্ণা পায় তা আমরা কবি মুকুন্দের লেখনীতে পাই-

'মোচড়িয়া গোঁফ দুটা বান্ধিলেন ঘাড়ে।
একশ্বাসে সাত হাঁড়ি আমানি উজাড়ে ।।"

সাত হাঁড়ি আমানি, সুদ-জাউ, লাউ-মুসুরির সুপ, দুই-তিন ঝুড়ি আলু-ওল পোড়া, কচু-ঘন্ট, নকুল-গোধিকার শিক কাবাব খাওয়ার পরও সে স্ত্রী-ফুল্লরাকে বলেছে— "রন্ধন কর্যাছো ভালো আর কিছু আছে।" তার খাদ্য গ্রহণ ও শয়ন সম্পর্কে কবি মুকুন্দ উল্লেখ করেছেন—

"শয়ন কুৎসিত বীরের ভোজন বিটকাল।
ছোট গ্রাস তোলে যেন তেয়াটিয়া তাল ॥"

অসীম দারিদ্র্য ব্যাধ কালকেতুর জীবনের অঙ্গ ছিল। কিন্তু দেবী চণ্ডীর পূজা প্রচারের জন্য যেহেতু কালকেতুর জন্ম, তাই দেবীর কৃপায় বহুমূল্যবান অঙ্গুরীয় ও সপ্ত ঘড়া ধন প্রাপ্ত হয়ে গুটরাট-নগর পত্তনের আদেশ পালন করেন কালকেতু। সমগ্র কাব্য জুড়ে লক্ষ্য করা যায় কালকেতু পুত্র স্বামী ও রাজা হিসেবে ত্রিবিধ পরিচয়ে সার্থক চরিত্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে আছে। স্ত্রীর ভরণ পোষণের দায়িত্ব স্বামীর কর্তব্য এই বিষয়টি সম্পর্কে কালকেতু যথাযথ অবগত। তাই ফুল্লরার চোখে জল দেখে বিচলিত হয়ে বলেছে—

"ছা-কান্দ কান্দনে কান্দে চক্ষে বহে নীর।
সবিস্ময় হইয়া জিজ্ঞাসে মহাবীর।
শাশুড়ী ননদী-নাহি নাহি তোর সতা।
কার সঙ্গে দ্বন্দ্ব করি চক্ষু কৈলি রতা।"

রাজা হিসেবেও কালকেতু প্রজাদরদী, উজ্জ্বল ও আদর্শোচিত চরিত্র। তার জীবনের অর্থনৈতিক পরিবর্তন মন মানসিকতাকে আরো উন্নত করতে সহায়তা করেছে। তাই তো বুলান মণ্ডলের প্রতি কালকেতুর উক্তি—

"আমার নগরে বৈস যত ইচ্ছা চাষ চষ
তিন সন -বহি দিহ কর।
হাল প্রতি দিবে তঙ্কা কারে না করিও শঙ্কা
পাট্টায় নিশান মোর ধর ।।"

আসলে রাজা কালকেতু ব্যাধ কালকেতু থেকে অনেক বেশি শ্রেষ্ঠ হিসেবে কাব্যের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই চরিত্রের কার্যকলাপ এতটাই বাস্তব ভাবে ফুটে উঠেছে যে পাঠক চিত্তকে চিরকাল আকর্ষিত করেছে।

- **ফুল্লরা:**

'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যের আখেটিক খণ্ডের নায়িকা হলেন ফুল্লরা। নায়ক কালকেতুর স্ত্রী ও সঞ্জয়কেতু ব্যাধের কন্যা। সে সেবাপরায়ণা, স্বামীপ্রাণা ও সহজ ঝরল গৃহবধূ। স্বামী সোহাগিনী ফুল্লরা, স্বামীর প্রতি তার অগাদ ভালোবাসা। তাই তো মনে মনে সতীন কল্পনা করে ছদ্মবেশী দেবী চণ্ডীকে তাড়ানোর উদ্দেশ্যে আপন বার মাসের দুঃখ যন্ত্রণার কথা পরিবেশিত করেছে। কবি মুকুন্দ চক্রবর্তী ফুল্লরা চরিত্রের মধ্য দিয়ে নারী মনস্তত্বকে রূপ দিতে চেয়েছেন। তাই তো সতীন সন্দেহে দেবীকে সে নানা আদর্শ ও কর্তব্য-সম্পর্কে জ্ঞান দিতে পিছপা হয়নি। মনের মধ্যে বিষ পোষণ করে রাখলেও মুখে মধুসঞ্চার করে দেবী চণ্ডীর সাথে কথা বলে তাকে তাড়ানোর চেষ্টা করেছে। কিন্তু ফুল্লরা বার মাসের বিবরণী শুনার পরও যখন বলে উঠেন-'থাকিব দুজনে যদি না বাসহ লাজ' এখন তার সমস্ত রাগ ও অভিমান গিয়ে পড়ে নিজের স্বামীর উপর; 'মরিবার তরে।,, কাহার ষোড়শী কন্যা আনিয়াছ ঘরে ।।" তারপর আবারও বলে-

"বামন হইয়া হাত বাড়াইলে শশী ।
আখেটির ঘরে শোভা পাইবে উর্বশী।।"

একথা আসলে তাঁর স্বামীকে সে বিদ্রূপ করে বলেনি বরং তার চোখের জল প্রমাণ করে যে তাতে রয়েছে অভিমান ও অনুরাগ ।

স্ত্রী-হিসেবে ফুল্লরা কাব্যের মধ্যে যতটা সজীব ঠিক ততটুকুই নির্জীব রানি ফুল্লরার চরিত্র। দরিদ্র কালকেতু যেমন তার স্বামী ছিল তেমনি রাজা কালকেতুতে কোন তেমনি রূপান্তর পাওয়া যায় না। বরং কলিঙ্গরাজের কাছ থেকে স্বামীকে মুক্ত করার জন্য কোটালকে যথাসর্বস্ব দান করতে চেয়েছে এবং কালকেতুকে প্রাণে না মারার অনুরোধও রেখেছে।

সমস্ত কাব্য জুড়ে ফুল্লরা চরিত্রটি স্নেহে-মমতায়, ভক্তিতে-সেবায় অভিমানে বোকামিতে এমনকি প্রত্যুৎপন্নমতিত্বেও যে এক জীবন্ত নারী হয়ে উঠেছে। স্বামী সর্বস্বতা ও স্বামী প্রেমই তার জীবনের আধার। কাব্যের শুরুতে লক্ষ্য করা যায় হয়তো দরিদ্র স্বামীকে যার-পর-নাই ভক্তি-শ্রদ্ধায় ভালোবাসায় আগলে রেখেছে এবং কোন পরিস্থিতিতেই স্বামীর কোন ভাগ সে কাউকে দিতে আপারগ । স্বামীর প্রেমে ধনবতী নারী ফুল্লরা কবির অপরূপ সৃষ্টি।

- **ভাঁড়ু দত্ত**

সর্বকালে সর্বদেশে খল, দুষ্ট, চতুর, স্বার্থপর চরিত্র বিদ্যমান থাকে এটা ধ্রুব সত্য। কবিকঙ্কণ মুকুন্দ চক্রবর্তী বাস্তববাদী কবি ছিলেন বলেই এদিক থেকে তাঁর দৃষ্টি এড়ায় নি। তাই তো ভাঁড়ু দত্তের মতো একটি টাইপ চরিত্র সৃষ্টি করে বাংলা সাহিত্যের জগতে চরিত্রটি অমরত্ব লাভ করেছে। গুজরাট নগর পত্তনের পর নানা জাতির বাস গড়ে উঠলে ধূর্ত কায়স্থ ভাঁড়ু দত্ত কালকেতুকে বলে "যখন পাকিবে খন্দ পাতিবে বিষম দ্বন্দ্ব।/ দরিদ্রের ধান্যে দিবে নাগা।"রাজা কালকেতু ভাঁড়ু দত্তের কথায় পাত্তা না দেওয়ায় সাধারণ প্রজাদের উপর অত্যাচার শুরু করার খবর পেলে তাকে রাজ্য থেকে বহিষ্কার করা হয়। অপমানিত ভাঁড়ু গুজরাটের প্রতিবেশী রাজ্যের রাজা কলিঙ্গরাজকে কালকেতুর বিরুদ্ধে উত্তেজিত করে যুদ্ধের ঘোষণা করে এবং সেই যুদ্ধে কালকেতু পরাজিত হয়ে কারাবরণ করেন। স্বার্থান্বেষী প্রতিহিংসাপরায়ণতা চরিত্র হিসেবে ভাঁড়ুদত্ত বাংলা সাহিত্যে স্থান করে আছে। তার বংশানুক্রমিক শয়তানি, নির্লজ্জতা , অর্থলিপ্সা ও চারিত্রিক স্থূলতা সর্বকালে সর্ব সমাজের টাইপ চরিত্রের প্রতিনিধিত্ব করেছে।

- **মুরারি শীল:**

চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে মুরারি শীল চরিত্রটি খুব স্বল্প কালের জন্য আবির্ভাব হলেও পাঠকের অন্তরে চিরকালের জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সে জাতিতে বণিক। কবি মাত্র একটি চরণে তার পরিচয় দিয়েছেন -

"কন্যা বড় দুঃশীল নামেতে মুরারি শীল লেখা-জোখা করে টাকাকড়ি।"

কাব্যের মধ্যে লক্ষ্য করা যায় দেবী চণ্ডী প্রদত্ত অঙ্গুরীয় বিক্রির উদ্দেশ্যে কালকেতু মুরারি শীলের কাছে কালকেতু উপস্থিত হলে সে 'খুড়া খুড়া' সম্বোধনে আত্মগোপন করেছে শোধ করতে সে চায় না। কারণ অতিরিক্ত অর্থ লোলুপতা তার বিবেককেও মেরে দিয়েছে। তবে সে ভাগ্যবান ব্যক্তি কারণ ঠিক তার মতোই তার স্ত্রীরও স্বভাব। উপযুক্ত সহধর্মিণী পেয়ে তার স্বভাব ও অর্থ মন আরও বেশি সংকীর্ণ হয়ে পড়েছে। যখন তারা জানতে পারে কালকেতু পূর্ব ঋণ আদায়ের উদ্দেশ্যে আসেনি বরং দেবী প্রদত অঙ্গুরীয় বিক্রি করতে এসেছে ঠিক তখনই মুরারি পত্নী সমস্ত পরিস্থিতিটাকেই পাল্টে দিয়ে অঙ্গুরী দেখতে চেয়েছে। সহজ সরল কালকেতু এই ছল চাতুরি ধরতেও পারেনি। বরং অঙ্গুরীর প্রতি করা মুরারি শীলের মন্তব্যকে সে সত্য বলেই মেনে নিতে চেয়েছে। শঠ, অর্থলোভী মুরারি শীল অঙ্গুরী পরীক্ষা করে বলেছেন-

"সোনা, রূপা নহে বাপা এ বেঙ্গা পিতল।
ঘসিয়া মাজিয়া বাপু করেছ উজ্জ্বল।। "

অত্যন্ত নিপুণতার সঙ্গে কোটি টাকার অঙ্গুরীর মূল্য মুরারি শীল 'অষ্টপন আড়াই বুড়ি' তে নামিয়ে এনেছে। আর কালকেতু তা বিশ্বাস ও করে নিয়েছে। নিয়েছে তবে দেবীর দৈববাণী মুরারি শীলকে এই

কাজ করতে দেয়নি। এতেও মুরারি শীল বুদ্ধির সাথে নিজের দোষ ঢেকে নিজেকে মহৎ সাজানোর চেষ্টা চালিয়েছে—

"হৃদয়ে চিন্তিয়া কন্যা বলে মহাবীরে।
এতক্ষণ পরিহাস করিলাম তোমারে ।।"

ভাঙবে তবু মচকাবে না- এহেন চরিত্র ধূর্ত মুরারি শীল। উচিত মূল্য নিয়ে কালকেতু চলে গেলেও বাংলা সাহিত্যের জগতে মুরারি শীলের মতো চরিত্র অদ্বিতীয় হয়েই রয়ে গেছে।

অগ্রগতি নির্ধারক প্রশ্ন 'খ'

১। কালকেতু চরিত্র আলোচনা করুন। (১৫০-২০০ শব্দের মধ্যে)
২। ফুল্লরা চরিত্র আলোচনা করুন। (১৫০-২০০ শব্দের মধ্যে)
৩। ভাড়ু দত্ত চরিত্র আলোচনা করুন। (১৫০-২০০ শব্দের মধ্যে)

৭.৮ সমাজ চিত্র

মধ্য যুগের ষোড়শ শতকে রচিত কবিকঙ্কণ মুকুন্দ চক্রবর্তীর চণ্ডীমঙ্গল কাব্যটি সমগ্র মঙ্গলকাব্যের ধারায় অবিসংবাদিত শ্রেষ্ঠত্বের আসন অর্জন করেছে। মুকুন্দ তাঁর সমকালীন জীবন ও জগতকে দু'চোখ মেলে দেখে যা অনুভব ও উপলব্ধি করেছেন তারই প্রতিফলন ঘটিয়েছেন এই কাব্যে। সাহিত্য সমাজেরই দোসর কবি হচ্ছেন এর বাহক। জগৎ ও জীবন থেকে হওয়া জীবনবোধ ও বিস্ময়কর সৃজনী প্রতিভার জারক রসে জারিয়ে কবি সৃষ্টি করেছেন তাঁর অনুপম 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যটি। কবির ব্যক্তিজীবন ও দেবীর করুণার প্রসঙ্গ আনতে গিয়ে খুব স্বাভাবিক ভাবেই নিজের ব্যক্তি জীবনের কথা উঠে আসে। উঠে আসে বাঙালির যাপন চিত্র। প্রসঙ্গক্রমেই মুলা, বেগুন, সিম, নিম, পুইডগা, মুখী কচু, ফুলবড়ি, চিংড়ি মাছ, নকুল, গোধিকা, পোড়া, হাঁসের ডিম ইত্যাদি খাবার প্রচলিত ছিল। সবশেষে খাদ্য তালিকায় থাকত মুখশুদ্ধি হরিতকী।

কালকেতু ও ফুল্লরার বিবাহের বর্ণনাতে মধ্যযুগে হিন্দু সমাজের বিবাহের রীতিনীতির সঙ্গে ব্যাধ সমাজের নিয়মও লক্ষ্য করা যায়; যেমন- ভক্ষদ্রব্য দিয়ে বান্ধবের মেলা করা, জামাতারে পাতন কাঁড় (নিপাতাশর) দেওয়া দুই বেয়াইয়ের কোলাকুলি, বিয়ের পর ফুল্লরাকে তার মার আমনি খাওয়ার জন্য পাথর দান প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য প্রথাগুলি আছে। এছাড়া অতিসাধারণ মানুষের জীবনাচরণের বৃত্তান্ত ফুল্লরার বারমাস্যা অংশে দেবী চণ্ডীকে উদ্দেশ্য করে বর্ণনা করা হয়েছে।

সমাজের প্রচলিত রীতিনীতির মধ্যে তৎকালীন সামাজিক সমস্যা যেমন সতীন সমস্যা, পণপ্রথা, সহমরণ প্রথা, ঘরজামাই প্রথা প্রভৃতি বিদ্যমান ছিল। গোধিকা রূপিনী ছদ্মবেশী দেবী চণ্ডীকে ফুল্লরা প্রথম দর্শনেই নিজের সতীন ভেবেই সন্দেহ করেছিল। চণ্ডীর প্রতি ফুল্লরার উপদেশ' অংশে লক্ষিত হয়-

"সতিনী কোন্দল করে / দ্বিগুন বিলিবে তারে/ অভিমানে ঘর ছাড় কেনি'

কালকেতুর বিবাহের অনুবন্ধ অংশে পথপ্রথার উল্লেখ আছে- "পনের নির্ণয়-কৈল দ্বাদশ কাহন" ।

শুধু তা'ই নয় নীলাম্বরের- মৃত্যুতে ছায়ার সহমরণ প্রসঙ্গ মধ্যযুগের এই প্রথার অস্তিত্বকে ইঙ্গিত দেয়। মধ্য যুগের তৎকালীন সমাজে লোকাচার ও লোক বিশ্বাসের দিকটিও ধরা পড়ে নারীরা মা হওয়ার জন্য নানা ব্রত উপবাস পূজা পার্বণ করত। সাধভক্ষণ প্রসঙ্গে সুস্থ বাচ্চার জন্ম-দানের উদ্দেশ্যে নানা আচার -অনুষ্ঠানেরও প্রচলন ছিল । এতেই শেষ নয় এর সঙ্গে এসে পড়েছে সমকালীন সমাজ জীবনের একেবারে সাধারণ সাধারণ কথাগুলি, যা সময়ের সাথে সাথে এক দলিলের নামান্তর হয়ে উঠেছে।

মধ্যযুগের সমাজে ছিল জাতিভেদ প্রথায় মোড়া। বর্ণ-অনুযায়ী মানুষের বৃত্তি থাকায় সমাজে একে অপরের উপর নির্ভরশীল থাকতে হত। যদিও নারী পুরুষের কর্ম নিয়ে কোন ভেদাভেদ ছিল না। তবুও ব্রাহ্মণের স্থান ছিল সকলের উপরে। গুজরাট নগর পতনের অংশে লক্ষ্য করা যায়। ব্রাহ্মণকে ভূমি দান ও খাজনা না দেওয়ার কথা আছে। একই সমাজে বিভিন্ন জাতির বাস ছিল, পরস্পরের মধ্যে কোনো সাম্প্রদায়িকতা বা ধর্মাচরণে কোন মতভেদ ছিল না। তবে ব্রাহ্মণেরা শূদ্রদের অস্পৃশ্য মনে করত।

কালকেতু জাতিতে ব্যাধ, তাই ব্যাধ সমাজের চিত্র এই কাব্যে খুব স্পষ্ট করে উঠে এসেছে। তারা পশু শিকার করে, এবং পশুর মাংস হাটে বিক্রি করে এবং তাদের স্ত্রীরা অর্থাৎ ব্যাধ নারীরা। যেদিন শিকার জুটত না তারা অনাহারে দিন যাপন করত। শুধু পশুর মাংসই নয়, হাতির দাঁত, চামড়া, পশুর-শিং, বাঘছাল, গণ্ডারের খড়্গ প্রভৃতি বিভিন্ন ধরণের বস্তু বিক্রি করে ব্যাধেরা নিজের জীবন নির্বাহ করত। এই কাব্যের 'নিদয়ার সাধভক্ষণ' ও 'কালকেতুর ভোজন' অংশ লক্ষ্য করলে ব্যাধ সমাজের খাদ্যবস্তুর বিবরণ পাওয়া যায়। আমানি, খুদের জাউ, লাটমিশ্রিত মুসুরির সুপ, নেটল পোড়া, আলু-ওল পোড়া, হরিণের মাংস, কচু, করঞ্জা , আমড়া, দধি প্রভৃতি কালকেতুর ভোজন পর্বে উল্লেখিত রয়েছে ।

সন্তান জন্মাবার পর নবজাতককে নিয়ে নামকরণ, কর্ণভেদ , সূতিকা ভবনে আগুন জ্বালানো, নাড়ি ছেদনের সময় শঙ্খধ্বনি, ষষ্ঠী পূজা অন্নপ্রাশন প্রভৃতি অনুষ্ঠান পালন করা হত।

তাছাড়া সে সময়ে সমাজে ধনী ও শক্তি বলের স্বেছাচারিতার পরিচয়ও পাওয়া যায়। ধূর্ত ব্যক্তিরা ব্যাপারীদের কাছ থেকে ভূ-স্বামীর নামে কর আদায় করার প্রয়াস প্রবলভাবে ছিল। শট ভাঁড়ু দত্তের চরিত্র এই দিকের ইঙ্গিত দেয়। এছাড়াও সমাজে নানা ধরনের পাঁচালী কথকতা পুতুল নাচ, দাবা খেলা, পাশা খেলা ,লাটিম খেলা প্রভৃতি মনোরঞ্জনের জন্য প্রচলিত ছিল ।

মধ্যযুগের বাঙালী জীবনের খুঁটিনাটি বিষয়গুলি কবিকঙ্কণ মুকুন্দ চক্রবর্তীর তাঁর 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্য উপস্থাপিত করেছেন। এত সব কিছুর সংযোজনে কাব্যটি সজীব ও গতিশীল হয়ে ঐতিহাসিক দলিলের পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে।

৭.৯ অধ্যায়টি পাঠ করে আমরা কী শিখলাম

- কবিকঙ্কণ মুকুন্দ চক্রবর্তীর চণ্ডীমঙ্গল কাব্য সম্পর্কে জানলাম।
- কবি মুকুন্দের সম্পর্কে অবগত হলাম।
- কাহিনির মূল বিষয় বস্তু সম্পর্কে জানতে পারলাম।
- কবি মুকুন্দের ঔপন্যাসিক লক্ষণ সম্পর্কে জানলাম।
- এই কাব্যের বিভিন্ন চরিত্র সম্পর্কে জানতে পারলাম।
- চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের সমাজচিত্র নিয়ে বিস্তৃত ভাবে অবগত হলাম।

৭.১০ অতিরিক্ত পঠন

১. বন্দ্যোপাধ্যায়, অসিতকুমার (১৯৬০ খ্রি.); বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত (২য় খণ্ড), মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রা:লি:

২. ভট্টাচার্য্য, আশুতোষ (১৯৪৭ খ্রি.); মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস, কলিকাতা বুক হাউস

৩. বিশ্বাস, অচিন্ত্য (সম্পা) (প্রথম প্রকাশ ১৩০৩ বঙ্গাব্দ (১৪৯৬ খ্রি.); বিজয় গুপ্তের মনসামঙ্গল, নিউ বইপত্র, কলকাতা

৪. সেন, সুকুমার; (১৯৪০ খ্রি) বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (১ম খণ্ড), আনন্দ পাবলিশার্স

৭.১১ অগ্রগতি নির্ধারক উত্তর-সংকেত

অগ্রগতি নির্ধারক প্রশ্ন 'ক'

১। নং প্রশ্নের উত্তর-সংকেত: আখেটিক খণ্ড কালকেতু ও ফুল্লারার কাহিনি : ..... এই সুযোগে দেবী চণ্ডী- স্বর্ণ- গোধিকা বেশ ত্যাগ করে অপরূপ রমণী বেশে কালকেতুর ঘরের দাওয়ায় বসে থাকলেন। ..... এরপরে থেকেই মর্তভূমে পৃথিবীতে দেবী চণ্ডীর পূজা প্রচারিত ও প্রতিষ্ঠিত হল। এভাবে উত্তর সাজিয়ে লিখুন।

২। নং প্রশ্নের উত্তর-সংকেত: মধ্যযুগের কবি মুকুন্দ চক্রবর্তী একজন জীবনরসিক কবি।..... দুঃখ থেকে উত্তরণের পথ খুঁজে পেতে সচেষ্ট হয়েছেন।..... দক্ষ ভাস্কর্যশিল্পীর মতো নিখুঁত - ভাবে নির্মাণ করেছেন, যা একজন কালজয়ী কবির পক্ষেই সম্ভব। এভাবে উত্তর সাজিয়ে লিখুন।

৩। নং প্রশ্নের উত্তর-সংকেত: গুজরাট নগর পতনের সময় কবি মুকুন্দ নতুন সমাজ গঠনের স্বপ্নকে কাব্যে বাস্তব করেছেন। সর্বজাতির, সর্বধর্মের মিলন ক্ষেত্র হয়ে ওঠেছে গুজরাট নগর। সেখানে মানবতার হানিকারক মানুষের কোন স্থান নেই। যার স্পটে উদাহরণ ভাঁড়ু দত্তের মতো চরিত্র। -এভাবে উত্তর সাজিয়ে লিখুন।

অগ্রগতি নির্ধারক প্রশ্ন 'খ' ১। নং প্রশ্নের উত্তর-সংকেত: চণ্ডীমঙ্গলের আখেটিক খণ্ডের নায়ক কালকেতু।..... ব্যাধ সন্তান কালকেতু অন্ত্যজ শ্রেণির মানুষ হওয়ায় তাঁর আচরণের মধ্যে ছিল আদিতা বা বন্যভাব। ..... রাজা হিসেবেও কালকেতু প্রজাদরদী, উজ্জ্বল ও আদর্শোচিত চরিত্র । .....আসলে রাজা কালকেতু ব্যাধ কালকেতু থেকে অনেক বেশি শ্রেষ্ঠ হিসেবে কাব্যের মধ্যে চিত্রিত। -এভাবে উত্তর সাজিয়ে লিখুন।

২। নং প্রশ্নের উত্তর-সংকেত: 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যের আখেটিক খণ্ডের নায়িকা হলেন ফুল্লরা। ..... স্ত্রী-হিসেবে ফুল্লরা কাব্যের মধ্যে যতটা সজীব ঠিক ততটুকুই নির্জীব রানি ফুল্লরার চরিত্র। ..... স্বামীর প্রেমে ধনবতী নারী ফুল্লরা কবির অপরূপ সৃষ্টি। -এভাবে উত্তর সাজিয়ে লিখুন।

৩। নং প্রশ্নের উত্তর-সংকেত: সর্বকালে সর্বদেশে খল, দুষ্ট, চতুর, স্বার্থপর চরিত্র বিদ্যমান থাকে এটা ধ্রুব সত্য।..... তার বংশানুক্রমিক শয়তানি, নির্লজ্জতা , অর্থলিপ্সা ও চারিত্রিক স্থূলতা সর্বকালে সর্ব সমাজের টাইপ চরিত্রের প্রতিনিধিত্ব করেছে। -এভাবে উত্তর সাজিয়ে লিখুন।

? ৭.১২ আদর্শ প্রশ্নাবলি

১। 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিন।
২। চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের বিভিন্ন চরিত্রের আলোচনা করুন।
৩। "এ যুগে জন্ম গ্রহণ করিলে তিনি যে কবি না হইয়া একজন ঔপন্যাসিক হইতেন, তাহাতে সংশয়মাত্র নাই"—সপক্ষে আলোচনা করুন।
৪। চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে ফুটে ওঠা সমাজজীবনের চিত্র নিজের ভাষায় লিখুন।

*** *** ***